বেদ ও বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তা সমীক্ষা

পি-এইচ.ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গবেষিকা

মৈত্রেয়ী জানা

নিবন্ধন সংখ্যা – A00SA0100618

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকাঃ	1-3
প্রথম অধ্যায়ঃ সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কৃতি ও আচারাঙ্গের নিরিখে আতিথেয়তা	4-9
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বৈদিক বাঙ্ময়ে আতিথেয়তা প্রসঙ্গ	10-16
তৃতীয় অধ্যায়ঃ বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তা বিমর্শ	17-32
ক. ধর্মশাস্ত্রে তথা স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে বর্ণিত অতিথেয়তা	
খ. পুরাণ,রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতিতে বর্ণিত আতিথেয়তা	
চতুর্থ অধ্যায়ঃ আধুনিক সমাজে সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত আতিথেয়তার প্রাসঙ্গিকতা	33-34
উপসংহারঃ	35-38
গ্রন্থপঞ্জি	39-43

বেদ ও বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তা সমীক্ষা

ভূমিকা

দেবতার কাছে মানুষ ইষ্টলাভের জন্য যে প্রার্থনা নিবেদন করে, তার মধ্যে হয়তো মানুষের কিছু দুর্বলতা প্রকাশ পেতে পারে, সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, উৎকট পৌরুষের ঔদ্ধত্য ও আস্ফালন কিন্তু সেখানে প্রকাশ পায় না। ইষ্টলাভের আশায় প্রার্থনা অথবা অভীষ্টপূরণের কোন অদৃশ্য শক্তির কাছে অভাবিত ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা নিবেদন লজ্জাকর ও মানবতাবিরোধী কোন কাজ অবশ্যই নয়। আপন অন্তরেরই গভীর অনুভূতির তা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। প্রথমে যে মন্ত্র ও অনুষ্ঠান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক, ভাবের ও ভাষার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের কারণে এবং ঋষি-হৃদয়ের আপন অনুভূতি ও ঋষির মধুর ব্যক্তিত্বের কারণে সকলের নিকটে বিশেষ আকর্ষণীয়-অনুসরণীয়, পরবর্তীকালে সমাজজীবনে তা ঐ অনুসরণ ও অনুকরণের ফলে বিস্তার লাভ ক'রে নানা সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়।

মানুষকে ক্রমোত্তরণের পথে নিয়ে যেতে যা কিছু সাহায্য করে, যা মানুষকে করে অনুশীলিত ও পরিশীলিত, যা উত্তরণের স্পৃহা ব্যক্ত করে তাই ধর্ম। কিন্তু সমাজের সকল স্তরের মানুষের পরিশীলিত হয়ে ওঠার প্রেরণা ও শক্তি সমান নয়, মনের ভাবকে প্রকাশ করার রীতিও সকলের সমান নয়। এই ভেদ থেকেই সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম এবং একই ধর্মের মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন উপধর্ম ও লোকধর্ম। উন্নত ও পরিশীলিত ধর্মের মধ্যেও তাই দেশাচার, দশাচার, কুলাচারের প্রভাবে অনুন্নত লোকধর্মেরও অনুপ্রবেশ ঘটে। কখনও কখনও আবার লোকধর্মের মধ্যেও উন্নত ধর্মের কিছু আঙ্গিক প্রবেশ করিয়ে তাকে উন্নতরূপ দান করার চেষ্টা করা হয়। তারই ফলে নানা ধর্মগ্রন্থে বহু উন্নত ধারণার ও উদাত্ত ধারণার পাশাপাশি বেশ কিছু

অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ ধারণারও সন্ধান পাওয়া যায় এবং তথ্যানুসন্ধানীদের কাছে তা বিশেষ বিস্ময়েরও সৃষ্টি করে। কিন্তু সমাজের মত সাহিত্যে এবং ধর্মাচরণে ভালো ও মন্দের, সুন্দর ও অসুন্দরের, উৎকর্ষ ও অপকর্ষের এই বিমিশ্রণ অনিবার্য।

বর্তমান সময়ে অবশ্য নানা দিক থেকে সমাজের বিরাট পরিবর্তন ঘটায় অনুষ্ঠানের প্রাচীন পদ্ধতি বা পুরাতন আচার-আচরণের প্রাচীন অনুসৃত পদ্ধতি ও ঋষি-কবিদের, সাহিত্যিকদের বাক্যের বা মন্ত্রের প্রতি অপার মুগ্ধভাব, সেই আন্তরিক গভীর আকর্ষণ আমরা ক্রমাগত হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু প্রবল গতি ও অভাবনীয় নানা যান্ত্রিক প্রগতি সত্ত্বেও মানুষের জীবনের নানাবিধ সংস্কারাদি পালন, অতিথি-অভ্যাগত উপস্থিত হলে তাঁদের যথাযথ আপ্যায়ন বা এমন কিছু কিছু পারিবারিক আচারগত অনুষ্ঠান আছে যা আমরা এখনও ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারিনি। এইসব আচার-আচরণ, অনুষ্ঠানে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশের ভাষা ও রীতি এখন ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ভিন্নমুখী হলেও সমাজের নানা আধুনিক, সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে থাকা সত্ত্বেও উৎকর্ষের অসুসন্ধানী মানুষ কেবল অতীত বলেই বা প্রাচীনরীতি বলেই অতীতকে ত্যাগ করতে, নিজের দেশের সংস্কৃতির পরম্পরা ও আপন পূর্বপুরুষদের প্রবর্তিত ঐতিহ্যের ধারার প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকতে পারেনা। তাই অতিথি-অভ্যাগত সৎকারাদি ক্রিয়া মহৎ অনুসৃত কর্মরূপে কাল থেকে কালান্তরে উৎকৃষ্ট মানবিকতা প্রদর্শনের ধারা হিসেবে সংঘটিত হয়ে চলেছে। জীবনকে উন্নততর করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহে, উন্নত আদর্শের সন্ধানে যিনি তৎপর হন সেই প্রকৃত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ সর্বদাই ব্যাকুল হন অনাগতের মতো অতীত সম্পর্কে সমৃদ্ধ হতে। অতীত প্রবর্তিত আচরণধারাকে নিজ জীবনে আচরিতব্য কর্তব্যের মধ্যে সামিল ক'রে জীবনকে পরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। অতিথি-অভ্যাগত সৎকার বা আপ্যায়নরীতি তাই সুপ্রাচীনকাল থেকে মানবিক উত্তরণের উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়ে চলেছে। আতিথ্যগুণ

সমৃদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল নিদর্শন পাই পালনীয়, করণীয় আচার বিধির মাধ্যমে। প্রকৃষ্ট মনুষ্যত্ব প্রতিপাদক গুণাবলীর মধ্যে আতিথেয়তা একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য - এই গুণটির সরসতায় সিক্ত হয়ে রয়েছে সেই প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সভ্যতা।

প্রথম অধ্যায়

সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কৃতি ও আচারাঙ্গের নিরিখে আতিথেয়তা

সুপ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সুবিশাল ইমারত নির্মিত হয়েছে যে সাহিত্যকে ভিত্তি করে অর্থাৎ সকল প্রাদেশিক ভাষার ও সাহিত্যের জন্মকথার অনুসন্ধান মেলে যেখান থেকে, সেই সংস্কৃত সাহিত্য স্বকীয় বিরাটত্বে, ভাবগাম্ভীর্যে, উদাত্ত ভাষার ছন্দোময় গতিতে ও অলংকারের ঝঙ্কারে অধ্যয়নানুরাগী চিত্তকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে। আর্যদের জ্ঞান-গরিমার ও হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম ভাবধারার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে সংস্কৃত সাহিত্য। কলকলনাদিনী পূতসলিলা গঙ্গা সুবিশাল আর্যাবর্তের উপর দিয়ে প্রবাহিতা, নর্মদা নদীর পুণ্যস্রোতে দাক্ষিণাত্যের ভূমি স্নাত ও ধৌত, সেরূপ সংস্কৃত সাহিত্যের অনাবিল ব্যাপক ভাবধারায় সিক্ত ও সমৃদ্ধ প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি। মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, গীতিকবিতা, চম্পূকাব্য, দূতকাব্য, শতককাব্য, কথা-আখ্যায়িকা সহ সমগ্র বৈদিকসাহিত্যে বিভিন্ন অভিনব নিপুণ সরস রচনার সমাবেশ ঘটেছে। রচনাকৃতির বিরাটত্ব বা ক্ষুদ্রত্বের প্রশ্ন বিবেচ্য নয়, রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষই বিচারসাপেক্ষ।

সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক যেমন সংহত ও উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হয়েছে বোধকরি আর অন্য কোনো ভাষার সাহিত্যে তা হয়নি। প্রত্যেক প্রাচীন সংস্কৃতিই কৌতূহলোদ্দীপক। ভারতীয় সংস্কৃতি সামাজিক ক্রমবিবর্তনের পথে অবশ্যই এক বিশেষ উন্নত অবস্থায় মানব সভ্যতার ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং চিন্তা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছে। ভারতের ইতিহাসে ঋগ্বেদীয় যুগের উষা লগ্নে যে দার্শনিক প্রকৃতি এবং অন্তর্মুখীনতার সূত্রপাত হয় তাই ই পরবর্তীকালে প্রসারতা ও

গভীরতা লাভ ক'রে পরিণামে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে প্রতিভাত হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। সভ্যতা বলতে আমরা বুঝি জীবনের আনুষ্ঠানিক ও প্রতিষ্ঠানমূলক বিষয়সমূহ ; আর সংস্কৃতির অর্থ কৃষ্টি – মানসিক ও বুদ্ধিগত উৎকর্ষ। এককথায় জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয় দিকেরই পরিমার্জন সভ্যতা ও সংস্কৃতির লক্ষ্য। 'সংস্কৃতি' বা কৃষ্টি (Culture) কিন্তু সভ্যতার চেয়ে ব্যাপকতর ধারণার দ্যোতনা করে। সংস্কৃতি কোন জাতির বা জনগণের জীবনরসে পুষ্ট হয়, তাকে ধার করা যায় না - তা জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। 'সভ্যতা' একটি মহৎ অবদান ; কিন্তু 'সংস্কৃতি' মহত্তর প্রেরণার উপলব্ধি। বংশের পর বংশক্রমে সংস্কৃতির উত্থান ও পতন ঘটে। বৃহত্তর অর্থে 'সংস্কৃতি' অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বিশেষ। মানুষকে সভ্য ও মানবোচিত পদে উন্নীত করবার জন্য পৃথিবীতে যে সমস্ত মনোভাব ও চেষ্টা কার্য্যকরী হয়েছে, ভারতের সংস্কৃতি সেগুলির মধ্যে অন্যতম।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়মিত হয় যেসব নীতির দ্বারা তারই সাধারণ নাম ধর্ম। এই নীতি সমূহ সংকলিত হয়েছে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলিতে। বলাবাহুল্য, ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলি সবই প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। এই শাস্ত্রগুলিতে জীবনযাত্রার যে আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে নীতিরূপে, সংস্কৃত সাহিত্যসমূহে তাই অঙ্কিত হয়েছে বাস্তব দৃষ্টান্তরূপে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ধর্ম শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী। ধর্মশব্দটি কখনও কোনো একটি নির্দিষ্ট অর্থে স্থিত হয়নি, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষায় ধর্ম শব্দের অর্থ বিবর্তিত হয়েছে। ধর্ম শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ থাকায় এবং ভারতীয় ভাবধারায় ব্যবহৃত ধর্ম শব্দটির অন্য কোন ভাষায় সঠিক প্রতিশব্দ প্রায় দুর্লভ বলে শব্দটির অন্বিষ্ট অর্থ ধর্মাচরণ সম্বলিত ভারত-সংস্কৃতিকে তথা সভ্যতাকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে।

ধর্মের অনেক পরিচয়ের একটি হল সদাচার। সদাচারের মূল আবার ধর্ম। সেই ধর্ম শাস্ত্রীয় বিধির পরিপালন। এর দ্বারা শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা ও পটুতা জন্মায় এবং মন উদার হয়, সাত্ত্বিকতা বাড়ে। সদাচার রূপ ধর্মের অন্যতম প্রধান প্রয়োজন হল মালিন্য মোচন। মানুষের কিছু সুকুমার বৃত্তি ও চেতনার স্তরবিশেষের প্রাপ্তিই হচ্ছে তার বিশেষ ধর্ম। মহাভারতের দৃষ্টিতে ধর্মকে চিনতে চাইলে জানা যায় যে, কায়িক, বাচিক ও মানস শুভ প্রযত্ন যা কিছু তাই ধর্ম। অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মপ্রসাদ এই চারটি ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ হলে চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সদাচারী মানুষই অগ্রণী হন। অতএব আচরণই মানুষের ফল নির্দেশক। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গের সাধনের প্রথম শর্ত হল শাস্ত্রানুমোদিত পথে ধর্মের আচরণ, অর্থের উপার্জন ও কামনার প্রশমন ঘটাতে পারলে মোক্ষ বা আত্যন্তিক মুক্তির জন্য মানুষকে অন্য পন্থার আশ্রয় নিতে হয় না। এই শাস্ত্রানুমোদিত আচার-আচরণই পারে প্রার্থিত মোক্ষ প্রদান করতে। মুমুক্ষা মানবের চির কাঙ্ক্ষিত বিষয়; সদাচারী মানুষের মুমুক্ষার পথ নির্দেশিত হয় তার ঐহিক জীবনে আচার-আচরণ পালনের মাধ্যমে। প্রত্যেক বর্ণাশ্রমের মানুষ চায় শ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তি। জীবনচর্যার আলোকে প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত হয় নানা কর্মকাণ্ড। সেই কর্মসমূহের বিধিপূর্বক নিষ্পাদনই মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে পূর্ণতার মনিকোঠায়। সদাচার বা আচার পালনই প্রধান ধর্ম। শ্রুতি স্মৃতি সকলেই আচারকে মান্যতা দিয়েছেন। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি তাই আচরণে যত্নবান হবে। এই সদাচারের মধ্যে অতিথি সৎকার অন্যতম।

সংস্কৃত সাহিত্যে মানবধর্মের পরিচায়ক বহু আচরিতব্য কর্তব্য বিশেষরূপে আলোচিত হয়েছে। এই আচরিতব্য কর্তব্যগুলি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক স্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রাদির নিরিখে বা ধর্মশাস্ত্রগুলির বিচারে এই আচরিতব্য ক্রিয়াকাণ্ডগুলিকে আচারাঙ্গের অন্তর্গত বলে প্রমাণ করা যায়। অতিথি চরিত্রের উপস্থাপন, তার সেবা-সৎকারের মাধ্যমে ভারতীয় মনীষা উজ্জ্বল, উন্নত মনোভূমির নিদর্শন প্রতিস্থাপন করেছেন। অতিথি-অভ্যাগত প্রসঙ্গ

সংস্কৃত সাহিত্যে কিভাবে বিশ্লেষিত হয়ে ভারত সংস্কৃতির সুমহান দিকটিকে প্রস্ফুটিত করেছে তাই প্রতিপাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যজুড়ে এত সুন্দর সুন্দর জীবননীতি দৃষ্টান্ত-উপমাসহযোগে বর্ণিত হয়েছে তা সমগ্র পৃথিবীর সকল ধর্মের সম্পদ। ভাষায়, উপমার সৌন্দর্যে, নীতির মহনীয়তায় ও জীবনসত্যের সার সঙ্কলনে সংস্কৃত সাহিত্য বিশ্বের পরম সম্পদ। একটি জাতির প্রজ্ঞাধৃত সংস্কৃতির সুবর্ণ সাক্ষর সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। ধর্মের মূল কেবল কথা নয় বা ধর্মজ্ঞানও নয়, আচরণে। এই আচরণ পালনের মধ্যে অতিথি সৎকার কে মহত্ব প্রদান করা হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে। সদাচার করলে মানুষ দীর্ঘায়ু, ধনবান ও উভয়লোকে যশস্বী হয়। দুরাচারী ব্যক্তিরা কখনও দীর্ঘায়ু লাভ করে না। নিজের মঙ্গল চাইলে অতিথি অভ্যাগত সৎকারাদি সদাচারের মাধ্যমে আপন কর্তব্যরাজি সমাধা করা আবশ্যক। গৃহে অতিথি সমাগত হলে তার আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনার রীতি বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ভাবধারার অন্তর্গত। গৃহী অন্যান্য আশ্রমিক জীবনের আশ্রয়স্থল ও প্রাণস্বরূপ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতিথিকে দেবতার সমান গণ্য করা হয়। দেবতারূপ এই অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার রীতি-নিয়মাবলী ভারতীয় ঐতিহ্যের তথা সংস্কৃতির বিশিষ্ট অংশবিশেষ। অতিথি সৎকাররূপ এই উন্নত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ আমাদের আধুনিক সমাজেও পরিলক্ষিত হয়। অতিথি সেবার প্রসঙ্গ যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে দৃঢ় সম্বদ্ধ হয়ে আছে। তাই ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও অতিথি প্রসঙ্গ সুচারুরূপে বিধৃত হয়েছে এবং সাহিত্যে এই সংযুক্তির কারণ হিসেবে বলা যায় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন প্রসৃতিধারা অব্যাহত রয়েছে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে পিতা-মাতা-আচার্য যেমন মহনীয়-বরণীয় ও পূজনীয় অনুরূপভাবে অতিথিও সমপর্যায়বাচী। অতিথি আপন মাহাত্ম্য বিস্তারে এবং অতিথি সৎকারের মহিমার কারণে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সদাচার অভিলাষী, মুক্তিকামী ভারতীয় মনন

সর্বদাই অতিথি-অভ্যাগত সৎকারে ব্রতী। সংস্কৃত সাহিত্যে বিকীর্ণ অতিমূল্যবান সংস্কাররূপ মণিমুক্তো স্বরূপ অতিথি-অভ্যাগত প্রসঙ্গ বিষয়ক সাহিত্যিক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে ভারতীয় সংস্কৃতির এক সুমহান-গৌরবোজ্জ্বল ভাবধারাকে প্রকটিত করার প্রচেষ্টায় এই গবেষণা কর্ম। মানুষের জীবন দেহকে জীবিত রাখার প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে একটা মহত্তর কিছু পাওয়ার চেষ্টায় যাপিত হয় - এখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই যাপিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে অতিথিজ্ঞান ও তার সৎকার উল্লেখযোগ্য, সদ্ভাবের অন্তর্গত। সদ্ভাবকে নিত্যই যথাযথ অনুশীলন করতে হয় তাতে মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটে নতুবা সকল কর্মই পশুত্বে পরিণত হয়। কারণ দেহ হল এক ধরনের পশু ; সেই পশুকে অতিথি সৎকারাদি সদাচারে নিয়ত প্রবৃত্ত না রাখতে পারলে দেহমাত্রজীবী মানুষ পরমার্থ থেকে হয় বঞ্চিত। সদাচার জীবনের অলক্ষণসমূহ দূর করে। শাস্ত্রোক্ত কর্মসমূহের মধ্যে আচারই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আচার থেকেই সঞ্জাত হয় ধর্ম, ধর্ম প্রভাবেই মানুষ হয় মহনীয় আর এভাবেই মানুষ অভীষ্ট লাভে হয় সমর্থ। তাই ভারত সভ্যতা-সংস্কৃতির অবশ্য পালনীয় কর্তব্য রূপে অতিথি অভ্যাগত সৎকার উৎকৃষ্ট সদাচার।

ভারতবাসী তার প্রাত্যহিক জীবনে আচরণীয় কর্তব্যাদির মধ্যে সত্যবাদিতা, নির্লোভতা, অতিথিপরায়ণতা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়েছে, তাই স্বকীয়ত্বে ভারতের সংস্কৃতিই শ্রেষ্ঠ। ভারতের সংস্কৃতি বিশ্বমৈত্রীর বাণী বহন করে নিয়ে গেছে দেশ-দেশান্তরে, লাভ করেছে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা, কারণ একমাত্র ভারতের সংস্কৃতি বা ভারতীয় মননে সর্বদাই জড় জগতের সাফল্য প্রাধান্য না পেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে আত্যন্তিক মুক্তি। তাই এই প্রার্থিত মুক্তির আস্বাদে ব্যাপৃত হয়েছে ভারতজীবন, বেদ-উপনিষদ-ধর্মশাস্ত্র-পুরাণ-মহাকাব্যাদির নির্দেশিত পথে পরমার্থের সন্ধানে। এই অমিত সন্ধান সার্থক হয় তখনই যখন ভারতীয় সংস্কৃতিমনস্ক-সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি তার প্রার্থিতকে লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে এই পরমার্থ সাধনের সহায়ক

কারণ হিসেবে এবং ভারত-সংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গ হিসেবে আতিথেয়তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈদিক বাঙ্ময়ে আতিথেয়তা প্রসঙ্গ

সুদূর অতীতে আর্যদের সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-ভূমিতে স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছিল এক পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য যার মধ্যে বিধৃত আছে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবরণ। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশ যখন জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখার অভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে গভীর-গহন তমিশ্রায় আচ্ছন্ন, সে সময় আর্যসভ্যতার জ্ঞানগরিমায় ভারতবর্ষ মহীয়ান। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের উৎস হল বেদ। বেদ ভারতাত্মার মর্মবাণী। বেদ শাশ্বত-সনাতন। ঋকসংহিতার কাল থেকে বেদাঙ্গ রচনার অন্তিমপর্ব পর্যন্ত যে সুবিশাল সাহিত্য কেবল ভারতীয় সংস্কৃতির নয়, বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা করেছিল তাকে বৈদিক সাহিত্য রূপে অভিহিত করা যায়।

বৈদিক সাহিত্যে আমরা পাই দীর্ঘযুগবাহিত সুনিয়ন্ত্রিত ভাবনা ও সাধনার একটি পরিনিষ্ঠিত রূপ, যা বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত চিৎপ্রকর্ষের কতকগুলি অনিবর্তনীয় সঙ্কেতের বাহন। মানবের প্রাণধর্মের সাথে সম্পৃক্ত বলে এই সঙ্কেতগুলি বস্তুতই সনাতন। তাই মানুষের মানবিক-চারিত্রিক-আধ্যাত্মিক-সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী ও উপাদেয় এই সনাতনী সঙ্কেতরাজি যা বৈদিক সাহিত্য সমূহে বিকীর্ণ রয়েছে তা থেকে মানবিক উৎকর্ষতার রসদ অনুসন্ধান করা ও তা উপস্থাপন করাই এই গবেষণার কর্তব্য। বৈদিকযুগে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভের যে প্রয়াস ও সাধনা প্রচলিত ছিল তার বিবরণ আমরা বিভিন্ন বেদে তথা বৈদিকসাহিত্য ভাণ্ডারে পাই। বৈদিকসাহিত্যের আলোকে বিস্তারিত আচরিতব্য ধারা সমূহের সার্থকতা আজও অব্যাহত। সে ধারাকে অনুসরণ করবার প্রয়োজন আজও আমাদের ফুরিয়ে

যায়নি বলে কালের ব্যবধানে বর্তমান সমাজে একটা ব্যবধান সৃষ্ট হয়েছে বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হলেও বৈদিক ঋষিদের সুচিন্তিত, সুনির্দিষ্ট মার্গনির্দেশ আজও আমাদের পাথেয়। প্রাচীনত্বে এবং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মর্যাদায় পৃথিবীর সমূহ গ্রন্থের মধ্যে ঋগ্বেদ সর্বপ্রাচীন। মানবজাতির ইতিহাসে ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় রচিত হলেও বর্তমানে সেগুলি বিলুপ্তপ্রায়। মন্ত্র-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক ও উপনিষদ নির্বিশেষে বৈদিক সাহিত্যের বিভাগগুলির প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সংহিতা বা সংকলন গ্রন্থ বা মন্ত্রভাগের সাথে বাকি বৈদিক সাহিত্যের প্রভেদ সুস্পষ্ট হলেও ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে সীমারেখা সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়। সংহিতা বা মন্ত্র-সংকলনগুলিই বৈদিক সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এগুলির মধ্যে ঋগ্বেদ-সংহিতাকেই সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের ভিত্তি বলা হয়।

বৈদিক ঋষিরা ভাবের আবেশে দেবতার যে প্রশস্তি রচনা করেছেন যজ্ঞের আদর্শকে সামনে রেখে, ঋক্ সংহিতায় তারই সঙ্কলন করা হয়েছে। সব প্রশস্তিই একসময়ে রচিত হয়নি কিংবা কেবল ক্রিয়াকাণ্ডই যে রচনার উপলক্ষ্য তা নয়। বহু সূক্তেই দেবতার উদ্দেশ্যে প্রকাশ পেয়েছে কবিহৃদয়ের কেবলমাত্র উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাস। ঋগ্বৈদিক মন্ত্রগুলির সাহিত্যিক গাম্ভীর্য অটুট রেখে হৃদয়গ্রাহী বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির আঙ্গিকে বিচার করলে পাওয়া যায় অতিথি-আতিথ্য প্রসঙ্গটিকে। সাহিত্যিক বিচারে মন্ত্রসমূহে আতিথেয়তার প্রসঙ্গ বহু ক্ষেত্রে উত্থাপিত হয়েছে।

যাগের প্রথম কর্মই হল অগ্নিসংস্থাপন, অধ্যাত্মজগতে বলের সাধনায় প্রথম সোপান অগ্নিবিদ্যা। ঋগ্বেদে যদিও ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সূক্ত সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তিনিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হলেও ঋষি-দৃষ্টিতে অগ্নি পরম কাম্য দেব। শ্রৌত বা স্মার্ত সকল কর্মেই তার সতত অপরিহার্যতা। যজমান ও দেবতার সংযোজক হলেন অগ্নি। যজ্ঞক্ষেত্রে আরাধ্য দেবতার

প্রতীক স্বরূপ অগ্নিই উপস্থিত থাকেন ও যজমানের আতিথ্য গ্রহণ করেন। অগ্নি তাই শুধু যাগ সম্পাদক নন গৃহে গৃহে অতিথিরূপে অবস্থান করেন। তাই সকল দেবতাদের প্রতি প্রদর্শিত আতিথেয়তা বা যজ্ঞক্ষেত্রে অভ্যাগতরূপে আহ্বান পূর্বক আতিথ্য অগ্নির মারফৎ সাধিত হয়। তাই ঋগ্বেদের অগ্নি সম্পর্কিত নানা সূক্তে অগ্নি দেবতা যজমানের অতিথি রূপে স্তুত হয়েছেন। ঋগ্বেদের প্রায় দশটি মণ্ডলেই যজমানের পরম অতিথিরূপী অগ্নিকে আমরা পাই এবং একেক ক্ষেত্রে সেই অগ্নি একেকটি নাম অবলম্বন করে অবস্থান করছেন। সার্বিকভাবে অতিথিরূপী অগ্নির মানব হিতৈষণার দিকটি মন্ত্রগুলি পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায়। এথেকে সহজেই বোধগম্য হয় যে যজ্ঞক্ষেত্রে অতিথিরূপে সমাগত অগ্নি যজমানের প্রতি সদা প্রসন্ন এবং দেবতাদের প্রতিভূরূপে তিনি যজমানের আন্তরিক আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁর সর্বকল্যাণময়রূপ প্রকট।ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মন্ডলে অতিথির উপস্থিতির মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত, প্রিয় অতিথি গৃহে আগমন করলে গৃহস্বামী যেমন উৎফুল্ল চিত্তে তাঁর সমাদর করেন অনুরূপভাবে যাগক্ষেত্রে অগ্নিদেবতার আগমনেও প্রিয় অতিথি সমাগমের মত যজমান হন হৃষ্টচিত্ত।[১] ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে বৈশ্বানর অগ্নি বা ব্রহ্ম দেবতার স্তুতিপর্বে পাওয়া যায়-

‘তং শুভ্রমগ্নিমবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানমুক্থ্যম্।

বৃহস্পতিং মনুষো দেবতাতয়ে বিপ্রং শ্রোতারমতিথিং রঘূষ্যদম্।।’[২]

ঋগ্বেদসংহিতার চতুর্থ মণ্ডলে অগ্নির সার্বজনীন অতিথি স্বরূপটির বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি যজ্ঞক্ষেত্রে প্রধান ও অন্যান্য দেবতাদের পুষ্টি বিধান করেন।[৩] ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলেও অগ্নি দেবতার অতিথিরূপ পরিচায়ক বেশ কিছু মন্ত্র পাওয়া যায়। সবক্ষেত্রেই অগ্নি যজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডে অভ্যাগত ও তাঁকে যথাযথ আপ্যায়ন আবশ্যক এবং যজমান ইষ্টলাভের জন্য অগ্নিরূপী অতিথি সৎকারে সদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।[৪,৫] ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে বহু সূক্তে অগ্নিকে যজ্ঞ ভূমি অতিথিরূপে

আহ্বান করা হয়েছে ও যজ্ঞভূমির উপযুক্ত অভ্যর্থনা প্রদানপূর্বক যজমান অতিথি সৎকারের নিদর্শনও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতিথির প্রিয়ভাজনতা সর্বজনবিদিত। অগ্নি যজ্ঞক্ষেত্রে অতিথিরূপে উপস্থিত থেকে সকলের প্রীত্যোৎপাদন করেন।[৬] ষষ্ঠ মণ্ডলে অগ্নিদেবতা ছাড়াও আতিথ্য প্রসঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে। ইন্দ্রের পরিতুষ্টিতে প্রস্তোক এবং দিবোদাস কর্তৃক বহু ধনপ্রাপ্তি ও প্রাপ্ত ধনের উৎসর্গীকরণ দেখা যায়।[৭] সপ্তম মণ্ডলে অগ্নিকে যুবতম অতিথি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] অগ্নি কেবলমাত্র যজ্ঞভূমিতে নয় দেবলোকেও তিনি অতিথিরূপে প্রতিভাত- 'অভি যঃ পূরুং পৃতনাসু তস্থৌ দ্যুতানো দৈব্যো অতিথিঃ শুশোচ'।[৯] অতিথি অগ্নির বরানুকূল্যে নিকটগামী ব্যক্তি লাভ করেন প্রভূত ধনসম্পদ; এই অগ্নি বীর ধনবানের গৃহে সুখে শায়িত থাকেন, প্রতিগৃহে সুনিহিত হয়ে প্রীতিলাভ করেন- সেই অগ্নি সকলের অতিথি হয়ে থাকেন-

'যদাবীরস্য রেবতো দুরোণে স্যোনশীরতিথিরাচিকেতৎ।

সুপ্রীতো অগ্নিঃ সুধিতো দম আ স বিশেদাতি বার্যমিয়ত্যৈ।।'[১০]

ঋগ্বেদের পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণযুগের সমাজভাবনায় অতিথিসেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। অথর্ববেদের যুগে গৃহস্থের পারিবারিক জীবনে আতিথেয়তা ছিল অনস্বীকার্য কর্ম। অথর্ববেদে পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত একটি সম্পূর্ণ সূক্ত রয়েছে।[১১] যেখানে আতিথ্যের প্রশংসা করা হয়েছে।

তৈত্তিরীয় সংহিতার প্রথম কাণ্ডের ২য় প্রপাঠকের ১০ম অনুবাকে যজ্ঞক্ষেত্রে সোম আনয়নের সময় অতিথিরূপে সোমকে অভ্যর্থনা করা হয়।[১২] ১ম কাণ্ডে চর্মকে ইন্দ্রের অতিথিরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে।[১৩] এছাড়াও ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম কাণ্ডে অতিথি-আতিথেয়তা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

শতপথব্রাহ্মণে অগ্ন্যাধ্যান ও অগ্নিচয়নের সময় অগ্নিকে অতিথিরূপে সম্বোধন করে তাঁর আপ্যায়ন করা হয়েছে।[১৪] আতিথ্যেষ্টি যাগে অতিথিরূপে সোমের আপ্যায়ন করতে হয়।[১৫] শতপথব্রাহ্মণে বর্ণিত পঞ্চমহাযজ্ঞে গৃহস্থের অবশ্য করণীয় নিত্য যজ্ঞের মধ্যে অতিথি সৎকার অন্তর্ভুক্ত।[১৬]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অতিথি সৎকারের সুচারু পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।[১৭] ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজা বা কাঙ্খিত অতিথি এসে উপস্থিত হলে গৃহস্বামী বৃষ অথবা গরু প্রদানের মাধ্যমে অতিথি সৎকার করতেন।[১৮] তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে অগ্নিকে প্রিয়তম অতিথিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৯] ঐতরেয় আরণ্যকে মহাব্রতানুষ্ঠানের সময় অতিথির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।[২০] শুক্লযজুর্বেদের কঠ শাখার অন্তর্গত কঠোপনিষদে বালক নচিকেতাকে যমরাজের আতিথ্য প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত মনোগ্রাহী।[২১] তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্লী, মুণ্ডকোপনিষদ ও ছান্দোগ্যোপনিষদেও অতিথি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

তথ্যপঞ্জি

১. ঋগ্বেদ ২/২/৮

২. ঐ ৩/২৬/২

৩. ঐ ৪/১/২০

৪. ঐ ৫/১/৮

৫. ঐ ৫/১/৯

৬. ঐ ৬/২/৭

৭. ঐ ৬/৪৭/২০-২৩

৮. ঐ ৭/৩/৫

৯. ঐ ৭/৮/৪

১০. ঐ ৭/৪২/৪

১১. অথর্ববেদ ৯/৬

১২. তৈত্তিরীয় সংহিতা ১/২/১০

১৩. ঐ ১/৬/১২

১৪. শতপথব্রাহ্মণ ৪/২/৪/২৪

১৫. ঐ ৯/৫/১/২১

১৬. শতপথব্রাহ্মণ ১১/৫ /৬/১২

১৭. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২/১/৩

১৮. ঐতরের ব্রাহ্মণ ১/১৫

১৯. তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ ১৪/১২/১

২০. ঐতরের আরণ্যক ১/১/১

২১. কঠোপনিষদ্ ১/১/৯

তৃতীয় অধ্যায়

বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তা বিমর্শ

ভারতীয় সংস্কৃতির নির্ধারিত পালনীয় অনুশাসন বা সদাচার বা বিধির মধ্যে অতিথিসেবা বৈদিকযুগ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী যুগেও সমাদৃত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যসমূহে অতিথি-আতিথেয়তা প্রসঙ্গ যেভাবে বারংবার উত্থাপিত হওয়ার কারণে অনুপ্রাণিত মানবকুল অতিথিসৎকার দ্বারা পরমেষ্টি লাভের নিদর্শন রাখতে পেরেছে সেই আতিথ্যগুণের ধারা বেদের যুগের পরেও অব্যাহত ছিল। সুবৃহৎ বৈদিক সাহিত্যের শেষভাগে জ্ঞানকাণ্ড চরম পরিণতি লাভ করে উপনিষদের আঙিনায়। বৈদিকযুগের সুগভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি , সমুন্নত দার্শনিক চিন্তাধারা, পরাবিদ্যার পারমার্থিকত্ব স্বরূপ গভীর তত্ত্বালোচনার সাথে সাথে আতিথেয়তাকে প্রাধান্য দিয়ে আচরিত কর্তব্যের মধ্যে অতিথিসৎকারকে অন্তর্ভুক্ত ক'রে বেদপরবর্তী সমাজ এগিয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব মুক্ত বেদোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে অতিথিসেবার প্রসঙ্গ বারবার আপন গৌরবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বেদবিহিত জীবনচর্যার অঙ্গ হিসেবে বেদের যুগে আতিথেয়তা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ যেমন ছিল তেমন বেদ পরবর্তী সময়কালেও প্রাত্যহিক জীবনের উৎকর্ষতা সাধনের অঙ্গ হিসেবেও এই সদাচার গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তা বিমর্শ দুটি পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে – ক. ধমর্শাস্ত্রে তথা স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আতিথেয়তা, খ. পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতিতে বর্ণিত আতিথেয়তা। ধর্মশাস্ত্রসমূহ হল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক ও ভারতীয় জীবনচর্যার পূর্ণাঙ্গ দলিল। বৈদিক সাহিত্য ও লৌকিক সাহিত্যের মধ্যবর্তী যুগে ভারতবর্ষে দুই বৃহদায়তন মহাকাব্যের আবির্ভাব ঘটে –রামায়ণ ও মহাভারত। ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুযায়ী এই

দুই আর্ষ মহাকাব্যের ব্যাপকতা বিশাল। এগুলি বেদরচনার বহু পরে সমগ্র মানবজাতিকে উওরণের মার্গ নির্দেশ করার জন্য রচিত হয়েছিল সেখানেও অতিথি-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। নানা আঙ্গিকে কল্যাণার্থ নবতররূপে অতিথির প্রসঙ্গ প্রকাশোন্মুখ হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনায় বেদোত্তরকালীন সুদীর্ঘ সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তার প্রসঙ্গ পল্লবিত হয়েছে ।

ক. ধর্মশাস্ত্রে তথা স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আতিথেয়তা

ভারতীয়দের সংস্কার সাধনের প্রবল ইচ্ছাপ্রবাহ ধাবিত হয়েছে যুগান্তকারী আচরণগত কর্তব্য পালনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে। শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতির উজ্জ্বল গৌরবময় ক্রমোন্নতির কথা পর্যালোচনা করলে ভারতীয়দের অদ্ভূত প্রতিভা দর্শনে সশ্রদ্ধ প্রশংসায় পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতার সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের তুলনায় উৎকর্ষতায় মন ভরে ওঠে। কিন্তু বর্তমানে সারা পৃথিবীব্যাপী অত্যাধুনিক সাংস্কৃতিক সম্মোহনের দোর্দ্দণ্ড প্রভাবে নতুন ভারতের অধিবাসীরা অধিকাংশই অভিভূত হয়ে পড়লেও, কতগুলি অশুভ প্রভাব তরঙ্গায়িত হয়ে ভারতীয়দের নিজ আদর্শ থেকে বিচ্যুত করার ও ভারতমনকে বিপথগামী করার তীব্র প্রয়াস চালালেও প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র-স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে বর্ণিত মানবীয় উৎকর্ষ সাধনের দিকগুলি এখনও সমুজ্জ্বল। কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয় জগতের উৎকর্ষভাবনার ওপর আলোকপাত না করে- যে ইতিবাচক গুণগুলি ও যে সুকুমার বৃত্তিগুলি আমাদের সক্রিয় নৈতিকতার উপাদান স্বরূপ যা আমাদের ব্যষ্টিজীবন বা সমষ্টিজীবনের মানবিক সম্ভাবনাগুলির পথ উন্মুক্ত ক'রে সমগ্র মানবকুলের জন্য এক সুন্দর, পরিশীলিত জীবন গড়ে তুলতে পারে তার সযত্ন পরিপালনে ব্রতী হওয়া উচিত। বৈদিক সাহিত্য সমূহ থেকে ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে সেই পথ নির্দেশ করা হয়েছে। জাগতিক পারিবারিক জীবনে নানা আচরিতব্য কর্তব্যগুলির মধ্যে এক অতি বিদিত, প্রাঞ্জল সামাজিক রীতি হল আপ্যায়নের রীতি। সরল-শৃঙ্খলাবদ্ধ মানবিক জীবনের এই আপ্যায়নের

রীতিকে ধর্মশাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কারণ আপাতদৃষ্টিতে সহজ রীতিযুক্ত এই অতিথি-অভ্যাগত আপ্যায়নের ধারা অনেক ক্ষেত্রে অবহেলিত হলেও এই সনাতন রীতির পালনে অমনোযোগী হলে সামাজিক মানুষ মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক মুক্তির উচ্চ লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয় এবং ফলস্বরূপ চারিত্রবল, কর্মদক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও মানবকল্যাণের যে সম্ভবপর লক্ষ্য তাও অনার্জিত থেকে যায়। সামাজিক গুণাবলী ও বিকশিত সুকুমার বৃত্তিগুলির মধ্যে অন্যতম হল অতিথিপরায়ণতা। এই অতিথি কে ? তাঁর স্বরূপ কি ? তাঁর আপ্যায়নের রীতিনীতি উল্লেখ পূর্বক ধর্মশাস্ত্রগুলি মানবীয় উৎকর্ষ প্রতিস্হাপনের এক সরলতম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দিককে তুলে ধরেছেন । প্রাত্যহিক নিত্য-নৈমিত্তিক কর্তব্যরাজির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে অতিথিসৎকার তার স্হান করে নিয়েছে। ধর্মশাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্যসূচীর অন্যতম হল আচার পর্ব। ভারতীয়দের প্রাত্যহিক কর্তব্য, দেশাচার, লোকাচার, বর্ণ ও আশ্রমধর্ম, গর্ভাধান থেকে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত সংস্কার, বেদাধ্যয়নবিধি আচারপর্বের আলোচ্য বিষয়। খাদ্যাখাদ্যবিধি, স্নাতকধর্ম, পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানবিধিও আচারকাণ্ডে পর্যালোচিত হয়েছে । মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আচারপর্বের বিষয়সমূহ বর্ণনায় বলেছেন –

‘ভার্যারতিঃ শুচির্ভৃত্যভর্ত্তা শ্রাদ্ধক্রিয়ারতঃ ।

নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ন হাপয়েৎ।।’[১]

সদাচার ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক’রে সামাজিক মনুষ্যবর্গকে সর্ব্বোচ্চ সাফল্যে পৌঁছে দেবার যে মহতী উদ্দেশ্য ধর্মশাস্ত্র গ্রহণ করেছিল তার অন্যতম উপায় হিসেবে অতিথি সৎকারের স্বরূপটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মনু গৃহস্হের বহু কর্তব্যকর্মের বা ধর্মপালনের নির্দেশ দিয়েছেন; যার মধ্যে পঞ্চমহাযজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত। এই যজ্ঞগুলি হল ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ –

‘ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্বদা।

নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং যথাশক্তি ন হ্যপয়েৎ।।’[২]

অর্থাৎ ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ– এই প্রকার মহাযজ্ঞ আছে, যাদের পরিত্যাগ করা উচিত নয়। গৃহীকে প্রত্যেকদিন এই পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হত। ‘মনুষ্যযজ্ঞ’ বা ‘নৃযজ্ঞ’ নামক কর্তব্য পালনের বিধিতে অতিথিসেবার বিধান দেওয়া হয়েছে। অতিথির সংজ্ঞা ও অতিথির প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য বিষয়ে মনুর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। অতিথির মূল অর্থ হল– যার কোনও নির্দিষ্ট তিথি নেই। একরাত্রির বেশি স্থায়িত্বও নেই-

‘একরাত্রং তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মিণঃ স্মৃতঃ ।

অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে।।’

অতিথি সৎকারের দ্বারা সদাচার সম্প্রাপ্ত হন বলে গৃহস্থ দরিদ্র বা অকিঞ্চন হলেও তাঁরপক্ষে অতিথি সেবারূপ কর্মের সরলীকৃত সমাধান দেওয়া হয়েছে –

‘তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।

এতান্যাপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।।’[৪]

অর্থাৎ গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্মের মধ্যে অতিথিসেবা মর্যাদা পেলেও দরিদ্র-অর্থহীন গৃহস্থের পক্ষে যদি অর্থব্যয়সাধ্য অন্নদান করা সম্ভবপর না হয় তবুও প্রকারান্তরে অতিথিসেবা করাই যায়। অতিথি বসার জন্য কুশকাশাদি তৃণের আসন, বিশ্রামের জন্য ভূমি বা স্থান, হাত-মুখ ধোওয়ার জন্য বা পানের জন্য জল এবং চতুর্থতঃ হিতকারী মিষ্টিবচন– এগুলি ধার্মিক ব্যক্তিদের বাড়িতে অভাব হয় না। মনু প্রবর্তিত সমাজব্যবস্থায় গৃহস্থ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে কালাতিপাত করতে সক্ষম হতো না। গৃহস্থের নির্ধারিত কর্তব্য কর্মাদিও খুব সহজ ছিল না।

পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও গৃহীর কর্তব্য সম্পর্কে মনু যে নির্দেশাবলী নির্ধারিত করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই বিশ্বচরাচরকে শাস্ত্রসম্মত উপায়ে পরিপালনের জন্য গৃহস্থকেও অনেক গুরু দায়িত্ব পালন করতে হত– এদের মধ্যে অতিথি পরিচর্যা ছিল অন্যতম।

মিথিলাবাসী যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য রচিত 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা' বা যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির স্থান মনুসংহিতার পরেই। মানবের পালনীয় বা আচরিতব্য কর্তব্যরাজির সুস্পষ্টতা ও সুসংবদ্ধতার কারণে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়। আচারাধ্যায়ে বর্ণিত নানাপ্রকার বিষয়ের মধ্যে গৃহস্থের কর্তব্য, পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদন, অতিথিসৎকারাদি সামাজিক বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সযত্নে বর্ণিত হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার আচারকাণ্ডে অতিথি কে? এবং অতিথিসৎকারের প্রণালী বিধৃত রয়েছে –

'বলিকর্ম্মস্বধাহোমস্বাধ্যায়াতিথসৎক্রিয়াঃ।

ভূতপিত্রমরব্রহ্মমনুষ্যাণাং মহামখাঃ।।'[৫]

"তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী"– এই মনুবচনের প্রতিধ্বনি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতে প্রকৃতই পরিলক্ষিত হয় ।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে কুড়িজন ধর্মশাস্ত্রকার হলেন– মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, ও বসিষ্ঠ। পৈঠনসী স্মৃতিতে ৩৬ জন ধর্মশাস্ত্রকারের নাম পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়, মনুস্মৃতিতে, অপরার্ক ও বালভট্টের যাজ্ঞবল্ক্য টীকা প্রভৃতিতে উল্লিখিত ধর্মাচার্যগণের সংখ্যা পরিসংখ্যা হিসেবে রচিত হয়নি। উল্লিখিত স্মৃতিকারদের অতিরিক্ত আরও

অনেক স্মৃতিকার রয়েছেন, যাঁরা অন্যত্র উল্লিখিত বা একেবারেই অনুল্লিখিত। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকায় আচার্য বিজ্ঞানেশ্বর স্পষ্ট করেই বলেছেন– 'নেয়ং পরিসংখ্যা কিন্তু প্রদর্শনার্থমেতৎ'। তাই কয়েকটি ধর্মশাস্ত্রে আতিথেয়তার প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

বিষ্ণুধর্মসূত্রে বিবিধ দৈববিষয় বর্ণিত হলেও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা-গৃহস্থের কর্তব্য প্রভৃতি বিশদে আলোচিত হয়েছে। অতিথি প্রসঙ্গে মহর্ষি বিষ্ণুর অভিমত হল– যে ব্যক্তি দেবতা (ভূতবর্গ), অতিথি, পোষ্য (অর্থাৎ বৃদ্ধ পিতামাতা প্রভৃতি), পিতৃলোক এবং আত্মা এই পাঁচ ব্যক্তির নির্বপন (অন্নদান) করে না, সেই ব্যক্তি জীবন্মৃত। ব্রহ্মচারী, যতি এবং ভিক্ষু (অর্থাৎ বানপ্রস্থ) এঁরা গৃহস্থাশ্রম থেকেই জীবিকা নির্বাহ করেন; অতএব এঁরা গৃহে অভ্যাগত রূপে উপস্থিত হলে গৃহস্থ এঁদের কখনই অবমাননা করবেন না। গৃহস্থ ব্যক্তিই যাগ করে, গৃহস্থই সেবা করে, গৃহস্থই তপস্যা করে, গৃহস্থই দান করে অতএব গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ । ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ ও অতিথিবর্গ গৃহস্থের মুখাপেক্ষী, অতএব গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ– জীবনের এই পর্যায়ে অভ্যাগতাদি সেবার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদিত হয়।[৬] অর্থাৎ অতিথিসৎকারের পরম ফল আছে। বৈশ্বদেবের পরেও যদি অতিথি আসেন যত্নপূর্বক তাঁর অর্চনা করতে হয়। অতিথিপূজক ব্যক্তি লক্ষ্মীর সান্নিধ্যলাভ করেন এই তথ্যও বিষ্ণুসংহিতাতে পাওয়া যায়।[৭] হারীতধর্মসূত্রের ভাষা ও বিষয়সূচী দেখে অনুমেয় যে হারীতসংহিতা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। মৈত্রায়ণীয় পরিশিষ্ট ও মানবধর্মসূত্রের সাথে হারীতসংহিতার সাদৃশ্যের নিবিড়তা থেকে স্থির করা যায় হারীত কৃষ্ণযজুর্বেদের সাথে সম্বদ্ধ ছিলেন। অতিথিবিষয়ক আলোচনায় হারিতের সুচিন্তিত মতামত পাওয়া যায়।[৮] পিতৃপ্রণীত শাস্ত্র পুত্র ঔশন্ শৌনক প্রভৃতি ঋষিদের অনুরোধে বর্ণনা করেন। মানবজীবনের আচরণীয় বহুবিধ নিয়ম নীতির বর্ণনায় সমৃদ্ধ এই ধর্মশাস্ত্র। আত্যন্তিক মুক্তি লাভের নানা পথের মধ্যে গুরুজন সম্পর্কে অচল শ্রদ্ধাভক্তির বর্ণনায়

গুরুসেবার নিদর্শন উপস্থাপিত হয়েছে। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির পাপক্ষয় হয় ও সে অমৃতত্ত্বলাভে সমর্থ হয়। এখানে সকলের গুরুরূপে অতিথি বর্ণিত হয়েছেন।[৯]

গুরুত্বের বিচারে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের পরেই পরাশরের স্থান। পরাশরের মতে কৃতযুগে অর্থাৎ সত্যযুগে সমস্ত ধর্মের উদ্ভব হলেও কলিযুগে মানুষের সদাচারের অভাবে সকল ধর্মই বিনষ্ট–'সর্বে ধর্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে'। পরাশরসংহিতাই কলিযুগে মানবের দিগ্দর্শক। পরাশরসংহিতার প্রাপ্ত সংস্করণের বারোটি অধ্যায়ের আলোচনায় তিনি প্রসঙ্গক্রমে চতুর্বর্ণের কর্তব্য ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করেছেন সত্য ছটি কর্ম (যথা সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবার্চনা) ও অতিথিপূজন প্রতিটি মানুষের নিত্যকর্তব্য। আত্মীয়-কুটুম্বের সাথে বা কার্যসাধনের জন্য আগত ব্যক্তি এবং একই গ্রামের অধিবাসী বিপ্র অতিথি বলে বিবেচিত হবেন না। যে ব্যক্তি নিত্য আসেন না, তিনিই অতিথি পদবাচ্য। যিনি আগে কখনও আতিথ্য গ্রহণ করেননি, এমন অতিথি ব্রতপালনকারী ব্রাহ্মণ এবং নিত্য বেদচর্চায় নিযুক্ত ব্রাহ্মণ এই তিনব্যক্তি অপূর্ব অতিথি শব্দ দ্বারা নিরূপিত।[১০] বৈশ্বদেব-সময়ে যিনি অতিথিরূপে প্রতিভাত হন তিনি যদি পাপী, চণ্ডাল, বিপ্রঘাতী বা পিতৃহন্তা হলেও তাঁর সৎকারপূর্বক গৃহস্থ স্বর্গলাভের পুণ্যার্জন করেন। আবার গৃহস্থের বাড়ি থেকে অতিথি যদি নিরাশ হয়ে গৃহত্যাগ করেন তাহলে সেই গৃহস্থের পিতৃপুরুষগণ হাজারবর্ষ অনাহারে থাকেন। যে গৃহস্থ বিপ্র, বেদপারঙ্গম অতিথিকে অন্নদান না ক'রে স্বয়ং ভোজন কর্মে ব্যাপৃত হন তিনি খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলেও সেই গৃহীত খাদ্যদ্রব্য পাপাদি ভক্ষণের সমতুল হয়।[১১]

পৌরাণিক তথ্যানুযায়ী মহর্ষি বেদব্যাস বা ব্যাসদেব পরাশর নন্দন, শক্তির পৌত্র ও বসিষ্ঠের প্রপৌত্র। ব্যাসসংহিতার ৩য় অধ্যায়ে মানুষের নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মসমূহ আলোচিত হয়েছে; এই প্রসঙ্গে অতিথিপূজন যে গৃহস্থের বিহিত কর্ম তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রশংসা, উত্তম গৃহস্থের গুণাবলী প্রভৃতি আলোচনাবসরে অতিথি ও আতিথ্যের বিষয়টি বিশদে ব্যাখ্যাত হয়েছে।[১২] অতএব অতিথি সৎকারের বিধি সম্পর্কে ব্যাসদেবের কিছু সিদ্ধান্ত যেমন মৌলিক তেমনি স্বাতন্ত্রের দাবিদার। মহর্ষি শঙ্খ রচিত ৩৩০টি শ্লোকান্বিত শঙ্খসংহিতার ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে অতিথি সংক্রান্ত আলোচনা পরিলক্ষিত হয়।[১৩,১৪]

রচনারীতির ব্যতিক্রমতায় তপোসিদ্ধ মহর্ষি লিখিত সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার দর্পণ স্বরূপ তাঁর লিখিত সংহিতাতে সামাজিক স্থিতি বজায় রাখার জন্য ধর্মশাস্ত্রোচিত বিধি-নিয়ম প্রবর্তনের সাথে সাথে অতিথি সৎকারের গুরুত্ব বর্ণনাবসরে মোক্ষ লাভের উপায় বর্ণনা করেছেন।[১৫]

দক্ষ রচিত ধর্মশাস্ত্রটি দক্ষসংহিতা নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। এই সংহিতার ৩য় অধ্যায়ে ৩৩টি শ্লোকে গৃহস্থের নয়টি সুকর্ম, নয়টি কুকর্ম, নয়টি গোপনীয় কর্ম, নয়টি কথিত কর্ম এবং নয়টি দানযোগ্য বস্তু সম্পর্কে বিশদে আলোচনা প্রসঙ্গে অতিথি সৎকার ব্যাখ্যাত হয়েছে।

ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গনে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হলেন গৌতম, তাঁর রচিত গৌতমসংহিতাতে সদাচার, গৃহস্থধর্ম, গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্তব্য সুনিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে অতিথি-আতিথ্য প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে।[১৬]

সুস্থ ও সংযত জীবন যাপনের জন্য কতগুলি মানবীয় সদ্গুণের উল্লেখ পাওয়া যায় বশিষ্ঠসংহিতাতে। বর্ণিত এই সদ্গুণাবলীর মধ্যে অতিথি সৎকার অন্যতম।[১৭] অতিথি পরায়ণ, সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিই অপরের কল্যাণসাধনে সমর্থ হন ও অভিপ্রেত লোকপ্রাপ্ত হন। মহর্ষি শাতাতপও আতিথেয়তাকে তাঁর রচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন।

বেশিরভাগক্ষেত্রে অতিথি-প্রসঙ্গটি প্রায় একইরকমভাবে আলোচিত ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে ধর্মশাস্ত্রগুলিতে পুণরুক্তি দোষ দেখা গেছে, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মহর্ষি মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে বাকি সমস্ত ধর্মশাস্ত্রকারেরা অতিথি ও তার সৎকারের প্রসঙ্গটিকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, একেকজনের ব্যাখ্যায় অতিথি সৎকারের একেকটি নতুন মার্গের সন্ধান পাওয়া যায়।

খ. পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত আতিথেয়তা

সংস্কৃত সাহিত্যে বৈদিক সাহিত্যের পরেই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে পুরাণের উল্লেখ করতে হয়। পুরাণসমূহে গুহিত হয়ে আছে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক ইতিহাস ও উত্তরকালে রচিত হওয়া সাহিত্যের আকরসম্ভার। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে অষ্টাদশ পুরাণের নাম যথাক্রমে- ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব বা বায়ু, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড। মার্কণ্ডেয়পুরাণ কর্মমীমাংসার মত গার্হস্থ্যধর্মকে অত্যন্ত উচ্চ স্থান দিয়েছেন। বিষ্ণুপুরাণানুসারে গার্হস্থ্যধর্মের ভিত্তি হলো পঞ্চমহাযজ্ঞ। গৃহস্থই বেদময়ী ধেনুরূপে সকলের আধার– 'পঞ্চযজ্ঞাশ্রিতং নিত্যং যদেতৎ কথিতং তব'। অতিথিকে স্বাগত জানানো, মিষ্টভাষার প্রয়োগ আবশ্যক।[১৮] গরুড়পুরাণে গৃহস্থ উৎকৃষ্ট আহার্য দানের পর শ্রোত্রিয় বা অতিথিকে গ্রামোপান্তে অনুগমনপূর্বক বিদায় সম্ভাষণা জানাতে বাধ্য থাকতেন বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে- 'শ্রোত্রিয়ম্ বা অতিথিং তৃপ্তং আসীমান্তাদনুব্রজেৎ'।[১৯] বরাহপুরাণ মতে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির জন্য একজন মানুষের অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ হওয়া উচিত। একজন অতিথি হলেন সমস্ত দেবতার মূর্ত প্রতীক, খাদ্যগ্রহণের সময় গৃহস্থের বাড়িতে একজন অতিথি উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও গৃহস্থ যদি অতিথিকে খাদ্য দান না করেন তাহলে তা ভগবানেরও অত্যন্ত দুঃখপ্রাপ্তির বিষয় হয়। অপরপক্ষে কোন মানুষ যদি প্রথমে দেবতা, অতিথি ও অন্যান্য জীবের উদ্দেশ্যে খাওয়ার দিয়ে তারপর নিজে গ্রহণ করেন তাহলে তিনি ভগবান বিষ্ণুর প্রীত্যোৎপাদন করতে সমর্থ হন। অতিথি হতাশ না হলে ভগবান সন্তুষ্ট হন।[২০] মৎস্যপুরাণে উৎকৃষ্ট গৃহস্থের গুণাবলীর মধ্যে আতিথ্যগুণও আবশ্যক।[২১] বিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব ঋষি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিতে গিয়ে নৃযজ্ঞের মাধ্যমে মানবিকধর্ম পালনের কথা বলেছেন।[২২] ভাগবতপুরাণে,[২৩] কূর্মপুরাণে[২৪] গৃহস্থকে অতিথিজ্ঞানে জীবসেবার পর অন্নগ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গরুড়পুরাণে

বানপ্রস্থীদের আতিথেয়তা সম্পাদনের রীতি ব্যক্ত আছে 'পিতৃদেবাতিথিম্ স্তথা'।[২৫] ভাগবৎপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের অতিথিসেবার সদিচ্ছার প্রসঙ্গ বারংবার উত্থাপিত হয়েছে যার প্রতিফলন 'শিশুপালবধম্' মহাকাব্যের ১ম সর্গে পাওয়া যায়। অতিবিস্তৃত পুরাণসাহিত্যের আনাচে কানাচে দৃষ্টান্তরূপে বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে এই প্রাচীন সংস্কার, যা ভারতীয় মনন-আচরণের অনন্যতার পরিচায়ক।

বৈদিক সাহিত্য ও লৌকিক সাহিত্যের মধ্যবর্তী যুগে ভারতবর্ষের দুই বৃহদায়তন মহাকাব্যের আবির্ভাব ঘটে, এদেশের যুগসঞ্চিত মনের বাসনা, প্রাণের আবেগকে উপজীব্য ক'রে সৃষ্টির বিশালতায়, ধর্মের ও দর্শনের, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে এই দুই মহাকাব্যে। রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি ও মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। ঋষি কবিদ্বয় দ্বারা রচিত রামায়ণ ও মহাভারতকে বলা হয় আর্ষ মহাকাব্য। বৈদিক সাহিত্যের ধারা যখন যজ্ঞীয় বিধি-নিষেধের নিয়মতন্ত্রে কঠোরভাবে শৃঙ্খলিত, তখন দেব ভাবনা ও ঔপনিষদিক অধ্যাত্মভাবনার বহিরঙ্গ মানবিক বীরগাথা ও লৌকিক ঘটনাশ্রিত ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ্যপ্রধান কাহিনী অবলম্বনে নতুন সাহিত্য ধারা উন্মোচিত যে সম্ভাবনা, তারই পরিণদ্ধ পরিণতির সার্থক সৃষ্টি আর্ষ এই মহাকাব্যদ্বয়। বিশেষতঃ এই দুই মহাকাব্যের স্রষ্টা তাঁদের কালজয়ী রচনার মাধ্যমে একটি সমগ্র দেশকে, একটি সমগ্র জাতিকে, একটি সমগ্র যুগকে নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত করে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করে তুলেছেন। রামায়ণ-মহাভারত তাই একাধারে ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্য। রামায়ণ-মহাভারতের আশ্চর্য মোহিনী শক্তি আড়াই হাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে সমস্ত ভারতবাসীকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কালের কষ্টিপাথরে যাচঞা করা অমলিন ও অম্লান এই দুই মহাকাব্য আজও অগণিত ভারতীয়দের প্রতিদিনের নিত্য পাঠ ও শ্রবণের বিষয়। সমাজ জীবন, রাষ্ট্রজীবন এবং ধর্মজীবন- সব ক্ষেত্রেই এগুলির অমিত প্রভাব।

রামায়ণ মৃত্যুঞ্জয়ী কাব্য রামায়ণে প্রতিফলিত নানা প্রকার উচ্চাদর্শ আমাদের জীবনের ও সমাজের ধ্রুবতারা। সমাজকল্যাণে বা পরমার্থ প্রাপ্তিতে রামায়ণে বর্ণিত চরিত্র সমূহের নানা নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলী আদর্শরূপে জনমানবে প্রতিফলিত। এই সামাজিক গুণরাজির মধ্যে আতিথেয়তার পরম্পরা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। রামায়ণে বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে অতিথি সৎকাররূপ শিষ্টাচার সাধনের চরম উদ্যোগ ছিল। বালকাণ্ডে পুত্রেষ্টি যাগের প্রাক্কালে আমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিকুলকে দশরথ রাজসিক উষ্ণ অভ্যর্থনা প্রদান করেন।[২৬] বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে অসুর নিধনের জন্য নিতে এলে দশরথ তাঁকে অতিথি জ্ঞানে সমাদর করেন।[২৭] নিষাদরাজ গুহ কর্তৃক রামচন্দ্রকে আপ্যায়ন অভ্যাগত সেবার রীতিকেই দ্যোতিত করে।[২৮] এছাড়াও বালকাণ্ডের ৫০তম অধ্যায়ে অতিথি সৎকারের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। অরণ্যকাণ্ডে উটজনিবাসিনী সীতা কর্তৃক ছদ্মবেশী রাবণকে আতিথ্য প্রদানের কথা সর্বজন বিদিত।[২৯] অরণ্যকাণ্ডে কিষ্কিন্ধ্যাতে যাত্রাকালে শবরী কর্তৃক রামচন্দ্রের প্রতি আতিথেয়তা চমকপ্রদ।[৩০] দণ্ডকারণ্যে, পঞ্চবটীতে রামচন্দ্র-সীতা-লক্ষ্মণ কখনও নিজেরা অতিথি আবার কখনও তাঁরা অন্যের প্রতি আতিথ্য প্রদর্শন করেছেন।[৩১] কিষ্কিন্ধ্যাকান্ডে স্বয়ংপ্রভা বিন্ধ্যারণ্যে বানরসেনাকে যে অতিথি সৎকার করেছিলেন তা অতুলনীয়।[৩২] এছাড়াও সুগ্রীবের রাম-লক্ষ্মণকে অতিথিরূপে আপ্যায়ন উল্লেখযোগ্য। লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ডে বিভীষণ রাবণ দ্বারা ভর্ৎসিত হলে রামচন্দ্র পরম সাদরে বিভীষণের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন। এক অভূতপূর্ব আতিথেয়তা দেখতে পাওয়া যায় উত্তরকাণ্ডে নির্বাসিতা সীতা ও বালক লবকুশের প্রতি ঋষিকুলের প্রদর্শিত আতিথ্য।[৩৩] বর্তমান যুগের নৈতিক অধঃপতন ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সর্বগ্রাসী প্রভাবের বিরুদ্ধে মানব জীবনে সুস্থ চিন্তার অনুশীলন ও শিষ্টাচার তথা সামাজিক স্বাস্থ্যের ও ন্যায়-নীতির পুণঃপ্রতিষ্ঠার জন্য রামায়ণে আলোচিত আতিথেয়তার প্রসঙ্গগুলি পরম উৎকৃষ্ট।

মহাভারত মানব সভ্যতার সর্ববিধ আচারঅনুষ্ঠান ও চিন্তার আকর-। এই মহাগ্রন্থে মানব- চরিত্রের যে জটিল রহস্য ও বৈচিত্র্য বিধৃত, ভারতীয় সাহিত্যে তার তুলনা পাওয়া যায় না। মহাভারতের অন্তর্গত নয় এমনকিছুর অস্তিত্ব ভারতীয় চিন্তার মধ্যেও অলভ্য। এই মহাকাব্যের বহুধা বৈচিত্র্যমণ্ডিত অসংখ্য চরিত্রের, বিশাল বর্ণময় মিছিলে সামিল যাঁরা, তাঁরা তাঁদের জীবনচর্যার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে অতিথিসৎকাররূপ শিষ্টাচার পালনের মাধ্যমে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। মহাভারতের সামাজিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আতিথেয়তার প্রসঙ্গ বারংবার উত্থাপিত হয়েছে। আদিপর্বে ঋষি ধৌম্য পান্ডবদের থেকে আতিথ্য লাভ করেন।[৩৪] এই পর্বেই ধৃষ্টদ্যুম্নের থেকে পাণ্ডবদের পরিচয় জানার পরে স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত পাণ্ডবদের রাজা দ্রুপদ পরম আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন।[৩৫] শান্তিপর্বে ব্রাহ্মণকে আতিথেয়তা শিক্ষণের জন্য গায়ত্রী উচ্চারণকারী এক ব্রাহ্মণের সকাশে কাল-মৃত্যু-যম ত্রয়ী উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণ তাঁদের অর্ঘ্যদানে আতিথ্য সমাধা করেন; এইসময়ে রাজা ইক্ষ্বাকু এসে সেখানে উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণ তাঁকেও আতিথেয়তা দিতে বাধ্য থাকেন। ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত ক্ষত্রিয়কে অতিথিরূপে সম্মান জানানো যে ব্রাহ্মণেরও কর্তব্য তাই প্রমাণিত হয়।[৩৬] ভারতীয় জনজীবনের আদর্শ সমূহ পালনের উৎকৃষ্ট পরাকাষ্ঠা মহাভারতেই দৃষ্ট হয়। বিশাল পারাবার স্বরূপ মহাভারত মনহনে রাশি রাশি অতিথিসেবার নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুশাসনপর্বে, আশ্বমেধিকপর্বে, উদ্যোগ, শান্তি পর্বে এর প্রাধান্য বেশী।

তথ্যপঞ্জি

১. যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১/২১

২. মনুসংহিতা ৩/৭০

৩. ঐ ৩/১০২

৪. ঐ ৩/১০১

৫. যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১/১০২

৬. বিষ্ণুসংহিতা ৫৯/২৫-২৯

৭. ঐ ৯৯/১৮

৮. হারীতসংহিতা ৪/৫৫-৫৯

৯. উশনঃসংহিতা ১/৪৭

১০. পরাশরসংহিতা ১/৩৯-৪৩

১১. ঐ ১/৫১-৫৩

১২. ব্যাসসংহিতা ৩/৩৭-৪৩

১৩. শঙ্খসংহিতা ৫/৭,১২,১৩

১৪. ঐ ৬/৩

১৫. লিখিতসংহিতা ৫

১৬. গৌতমসংহিতা ৩

১৭. বশিষ্ঠসংহিতা ৬,৮,৯ম অধ্যায়

১৮. বিষ্ণুপুরাণ ৩/৯/৫৬-৬১

১৯. গরুড়পুরাণ ১/১১৬/২৩-৫৭

২০. বরাহপুরাণ ২২০/৩৮-৩৯

২১. মৎসপুরাণ ১/৬০/৩

২২. বিষ্ণুপুরাণ ৩/৯/৯-১৭

২৩. ভাগবতপুরাণ ১০/৬৪

২৪. কূর্মপুরাণ ২/১৮/১১২-১১৮

২৫. গরুড়পুরাণ ১/১০২

২৬. রামায়ণ ১/১৩/১০-১৭

২৭. ঐ ১৮/৪২-৫৮

২৮. ঐ ২/৫০/৩৬-৫১

২৯. ঐ ৩/৪৬/৩৩-৩৭

৩০. ঐ ৪/৭৪

৩১. ঐ ৪/৫০-৫২

৩২. রামায়ণ ৬/১৬, ১৭,১৮

৩৩. ঐ ৭/৬৬

৩৪. মহাভারত ১/৮৪/৭

৩৫. ঐ ১/১৮৫

৩৬. ঐ ১২/২২২/৩২-৩৩

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক সমাজে সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত আতিথেয়তার প্রাসঙ্গিকতা

ভারতবাসী তার প্রাত্যহিক জীবনে আচরণীয় কর্তব্যাদির মধ্যে সত্যবাদিতা, নির্লোভতা, অতিথিপরায়ণতা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়েছে, তাই স্বকীয়ত্বে ভারতের সংস্কৃতিই শ্রেষ্ঠ। ভারতের সংস্কৃতি বিশ্বমৈত্রীর বাণী বহন করে নিয়ে গেছে দেশ-দেশান্তরে, লাভ করেছে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা, কারণ একমাত্র ভারতের সংস্কৃতি বা ভারতীয় মননে সর্বদাই জড় জগতের সাফল্য প্রাধান্য না পেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে আত্যন্তিক মুক্তি। তাই এই প্রার্থিত মুক্তির আস্বাদে ব্যাপৃত হয়েছে ভারতজীবন বেদ-উপনিষদ-ধর্মশাস্ত্র-পুরাণ- মহাকাব্যাদির নির্দেশিত পথে পরমার্থের সন্ধানে। এই অমিত সন্ধান সার্থক হয় তখনই যখন ভারতীয় সংস্কৃতিমনস্ক-সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি তার প্রার্থিতকে লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে এই পরমার্থ সাধনের সহায়ক কারণ হিসেবে এবং ভারত সংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গ হিসেবে আতিথেয়তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে

অতিথি সৎকারের দ্বারা শিষ্টাচার পরিপালনের উন্নত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ আমাদের আধুনিক সমাজেও পরিলক্ষিত হয়, তাই একবিংশ শতকের অত্যাধুনিক ভারতবর্ষের বাসিন্দারা প্রতিবেশী দেশ বা সারা পৃথিবী থেকে আগত পরিভ্রমণকারীদের অতিথি বলেই অভ্যর্থনা জানান। এছাড়া ভারতের এই আতিথ্যবাৎসল্য প্রকাশ পায় স্বমহিমা বিস্তারে গৌরবে উদ্ঘোষিত হয় 'অতিথি দেবো ভবঃ'।[১] সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত অতিথিসেবাকে প্রাচীন যুগে সমাজের প্রত্যেক স্তরে সকলেই সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। অতিথিসেবা যথোপযুক্ত উপায়ে না হলে অমঙ্গল সাধিত হবে এই ধারণা থেকে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের মানুষ অতিথি

সৎকারে হন ব্রতী। অতীতে মহৎ মানুষের বিশেষণরূপে একটি কথা প্রচলিত ছিল যে 'দেব-দ্বিজ-অতিথিপরায়ণ' অর্থাৎ সজ্জন ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অতিথিপরায়ণতা ছিল আবশ্যক। ভারতীয় সংস্কৃতির এই অতি মূল্যবান পরম্পরা এখন বিলুপ্তপ্রায়। যান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ অন্তঃকরণ প্রবৃত্তির সূক্ষ্মতম অনুভূতির সহায়তায় বর্তমানে অতিথিসেবা থেকে হয়েছে ভ্রষ্ট। কেজো সম্পর্কের বাইরে অতিথিবাৎসল্য প্রদর্শন তাই আধুনিক সমাজে নিষ্প্রয়োজনীয়তায় পর্যবসিত হয়েছে। তাসত্ত্বেও উন্নত আধুনিক ভারত অভ্যাগতসেবায় যে Hospitality সামগ্রিকভাবে প্রদর্শন করে তা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত আতিথ্যরূপ উজ্জ্বল প্রাচীন সংস্কৃতিরই অনুসরণমাত্র।

তথ্যপঞ্জি

১. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ১/১১/২

উপসংহার

জাগতিক সংসার বড়ই বিচিত্র। মানুষ জন্মায়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিষয় ভোগ করে, সন্তান উৎপাদন করে, তাদের পালন-পোষণ করে, ধন, জমি-বাড়ি ও অন্যান্য পার্থিব ভোগ্য-সামগ্রী আহরণ করে। এ বিষয়ে ন্যায়-অন্যায়ের পরোয়া না করে কালাতিপাত করে এবং অন্তিমে সকল ভোগ্যকে ফেলে রেখে অসাফল্য ও অতৃপ্তির দহন অনুভূত হয়ে চিন্তা ও পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে অসার সংসার থেকে বিদায় নেয়। এইরকম জীবন পশুদের জীবনের সাথে তুলনায় প্রভেদহীন। পশুও নিজেদের পেট ভরায়, সন্তান উৎপাদন করে ও শেষে মৃত্যুবরণ করে। তবে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে পশু আজকের মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত। তাদের ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, তারা সংগ্রহ করে না এবং সংগ্রহ করার জন্য অন্যের গলা টেপে না। আবার পশুদের তো নিজেদের হিতাহিত বিবেচনা করার বুদ্ধি নেই, কিন্তু ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন। তবে কেন মানুষ উন্নত চিন্তায় নিজেকে ব্যাপৃত না রেখে নানাবিধ পাশবিক প্রবৃত্তিকে আয়ত্ত করে সর্বোৎকৃষ্ট জন্মলাভের গুরুত্ব বোঝে না? যে মনুষ্য-জীবনকে শাস্ত্র দেবদুর্লভ বলে বর্ণনা করেছে তার সার্থকতা কি একমাত্র পার্থিব সুখভোগেই? এই সুখভোগ তো অন্য যোনিতে জন্মালেও সহজেই পাওয়া যায়। স্বর্গে যে সুখ ইন্দ্র-ইন্দ্রাণীর সঙ্গে রমণ-ক্রিয়ায় পান সেই সুখ তো মনুষ্যেতর জীবজন্তুও সহবাসে পায়। সুস্বাদু জিনিস খেয়ে আমরা আস্বাদ পাই, একই স্বাদ বিষ্ঠা খেয়ে শূকরও পায়। মখমলের নরম বিছানায় শুয়ে আমাদের যে আরাম বোধ হয় সেই একই আরামই গাধা ছাইয়ের গাদায় শুয়ে পেয়ে থাকে। তাহলে পশুদের সাথে আমাদের মানুষের পার্থক্য কোথায়? আমাদের জীবন ভোগময় হয়ে গিয়েছে। আমরা দিন-রাত জৈবিক সুখভোগের চিন্তায় মগ্ন থাকি। আমরা শরীরের সুখান্বেষণে ব্যাপৃত থেকে শরীরের পরেও যে কোনো আত্যন্তিক সুখ বলে কিছুর

অস্তিত্ব আছে সে সম্পর্কে ভাবার প্রয়োজন মনে করি না। সাংসারিক ভোগে মত্ত থাকার জন্য আমরা এই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জীবন লাভ করিনি। পার্থিব ভোগ্য বিষয় সকলই অনিত্য, অস্থির এবং ক্ষণভঙ্গুর। জোনাকি যেমন মুহূর্তের জন্য নিজের আলোক ছটা দেখিয়ে তখনই বিলীন হয়ে যায়, সেইরকম বিষয় ও সুখভোগও কেবলমাত্র ভোগকালেই সুখদায়ক প্রতীত হয়- ভোগ করার আগে আমরা সেগুলিকে প্রাপ্তির কামনায় উৎসুক থাকি কিন্তু তার পরিণাম হয় দুঃখদায়ী। ভোগকালীন সময়ে বিষয়সুখের শুধু প্রতীতিমাত্র হয়, বস্তুত তাতে পরিণামরমনীয়তা থাকে না। যদি প্রকৃত সুখ প্রাপ্তি সম্ভব হত তাহলে তা দীর্ঘস্থায়ী হত, তার বিনাশ হত না। তাই বিষয়সুখের প্রলোভন ত্যাগ করে যে সুখ প্রকৃত স্থায়ী, যার কখনও বিনাশ হয় না এবং যা মৃত্যুর পরেও থাকে সেই সুখ পাওয়ার জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। এই সুখ লাভ করাই হলো মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য- পরম পুরুষার্থ। জীবের ধর্ম হল অনন্ত সুখের সন্ধান করা। এই পরম সুখ লাভ করা একমাত্র মনুষ্য জন্মেই সম্ভব। অন্য কোন জন্মে সম্ভব নয়। কেননা অন্যান্য সমস্ত জন্মযোনি ভোগযোনি। মনুষ্য জীবনের কৃত শুভাশুভ কর্মের ফল আমরা অন্য যোনিতে ভোগ করি। কর্ম করবার অধিকার কেবল মনুষ্য যোনিতেই আছে। এজন্য একে কর্মযোনি বলে এবং এটি হল শ্রেষ্ঠ যোনি। তাই সাধনের ক্ষেত্র ও মোক্ষের দ্বার বলে কল্পিত। এজন্য দেবতারাও মনুষ্যযোনিতে জন্মাবার জন্য লালায়িত থাকেন। আর এই জন্যই এই মনুষ্য শরীর মরণশীল হওয়া সত্ত্বেও তাকে দেবদুর্লভ বলা হয়। তাই শাস্ত্রানুকূল আচরণাদি পালনের মাধ্যমে পরম সুখ অর্জন করা উচিত এবং তার জন্য কোন প্রয়াসকে ত্যাগ করা উচিত নয়। এরই মধ্যে নিহিত আছে আমাদের জীবনবোধের বিচার এবং জীবনের সার্থকতা। মানবিক অজ্ঞতার বিনাশ হয় পরমাত্মার প্রকৃত জ্ঞান থেকে। যেমন অন্ধকার দূর হয় আলোর দ্বারা তেমনি অজ্ঞতা-রূপ অন্ধকার দূর হয় জ্ঞানরূপী অন্তর-সূর্যের উদয় হলে। সেই পরমার্থের যথার্থ জ্ঞান, বিবেক ও বৈরাগ্যপূর্বক সদাচার পালন করেই হয়। সমগ্র মানবজীবনে পালনীয় সদাচারই

একমাত্র মুক্তির আস্বাদ দিতে পারে। অতিথিবাৎসল্য বা অতিথিপরায়ণতা মানুষের পালনীয় সদাচারগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। অতিথি সৎকারের মাধ্যমে অতিথিরূপে আগত জীবেরই সেবা করি আমরা। জীবসেবা হল শ্রেষ্ঠ সেবা। মানুষ যেকোনো বর্ণাশ্রমের, জাতির, সমাজের অথবা অবস্থার হোক না কেন অতিথিপরায়ণতা গুণলাভে তার কোন বাধা নেই। অতিথিসেবায় সকলেই অধিকারী- আর এই গুণার্জনে অধিকারীর আত্মোন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী।

বর্তমান সমাজে প্রায় সকল মানুষই প্রকৃত আত্মোন্নতির বিষয়ে বিমুখ। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ আত্মার উন্নতির চেষ্টা করেন। যে অল্প কয়েকজন চেষ্টা করেন তাঁদেরও অধিকাংশেরই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। সদাচার পালনের অনাগ্রহ, শ্রদ্ধাভক্তির ন্যূনতার কারণে প্রকৃত পথ প্রদর্শকেরও অভাব রয়েছে সমাজে। কিছু মানুষের মধ্যে সদাচার পালনের সদিচ্ছা থাকলেও সময়, সঙ্গ এবং স্বভাবের বিভিন্নতার ফলে তাঁরা নিজেদের চিন্তানুসারে চেষ্টা করতে পারেন না। এর প্রধান কারণ অজ্ঞতা, ঈশ্বর, শাস্ত্র ও মহানুভবদের প্রতি অশ্রদ্ধা। কিন্তু মানব জীবনে এই শ্রদ্ধার উন্মেষ কারও দ্বারা করানো সম্ভব নয়। শ্রদ্ধাশীল, সদাচারী মানুষদের সঙ্গ এবং নিষ্কামভাবে কৃত তপ, যজ্ঞ, দান, দয়া, জীবসেবার ইচ্ছা প্রভৃতি সাধনার মাধ্যমে হৃদয় পবিত্র হলে জীবের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়- এটিই হল অতিথিপরায়ণতার মূল কথা। মানুষ শ্রদ্ধাময় অতএব মানুষ প্রকৃত শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সদাচারী হতে পারে না এবং সদাচার পালনে অভ্যস্ত না হলে অতিথিসেবার মতো সৎকার্য সাধন কখনই সম্ভব নয়। তাই মানুষকে প্রথমে অতিথি সত্তার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে তবে তার সৎকারকল্পে ব্রতী হতে হয়। নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ এবং অকর্মণ্যতা প্রভৃতি কাজে জীবনকে অপচয় না করে সদ্বিবেচনাপূর্বক কল্যাণমার্গে নিজেকে নিয়োজিত করা উচিত। অতিথিসেবারূপ সৎকর্ম মানুষকে কুপথে নিয়োজিত করে না- সত্য বা উত্তম পথের নিদর্শক হয়, দুরাচার নিবৃত্ত করে এবং কল্যাণ পথের বিঘ্নকে অপসারিত করে। অতিথিসেবাদি কর্ম সাধারণভাবে সৎপথের নিত্য

প্রেরণাদাতা হওয়ার কারণে জীবের সার্বিক কল্যাণের সহায়ক। পাপকর্মাদিতে লিপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ হলো নিরন্তর বিষয়চিন্তা। রজোগুণোদ্ভূত কর্মের উৎপত্তি এ থেকেই হয়। সেইরূপ কর্ম থেকেই ক্রোধাদি দোষ উৎপন্ন হয়ে জীবের অধোগতির কারণ হয়। যদি জীব কাম বা কামনাকে জয় করে সদাচারে লিপ্ত হতে সক্ষম না হতে পারে তাহলে ভগবানের আদেশানুসারে শুভকর্ম, সৎ-সঙ্গতি, অতিথি-সৎকারাদিরূপ সদাচার সম্পন্ন হয়ে শুদ্ধ হয়। এজন্য মানুষের উচিৎ শাস্ত্রনির্দিষ্ট সদাচারী জীবনযাপন করা। ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করে কর্তব্য-বুদ্ধিতে অবিচল থেকে সদাচার প্রতিপালনের মাধ্যমে পরম তপের সাধনা করা যায় তাহলে মানুষ ইহলোকে এবং পরলোকে মুক্তিরূপ পরম শান্তি লাভ করবার উপযুক্ত হয়। অতএব আত্যন্তিক মুক্তি-পরম শান্তি প্রভৃতি লাভের চাবিকাঠি হল সদাচার; আর এই সদাচারের অন্তর্গত অতিথিবাৎসল্য তাই এতো গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অজ্ঞতার কারণে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, দেশ-কালে পরিচ্ছিন্ন, অনিত্য, বিনাশশীল ও দুঃখরূপ এবং দুঃখের হেতু সমূহতেই আপাত সুখ প্রতীত হয়। কিন্তু আত্যন্তিক মুক্তিকামী মোক্ষেচ্ছু পুরুষ বিষয়বিষের সম্পর্কে যথার্থ্য অবগত হয়ে কখনোই তাতে আসক্ত হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানবমন সাংসারিক অসার সঙ্কল্পগুলি থেকে নিবৃত্ত হয়ে সদাচার পালনের মাধ্যমে পারমার্থিক সুখ অন্বেষণে প্রবৃত্ত না হয় বা পরমাত্মাতে মগ্ন না হয় ততক্ষণ সদাচারের গুরুত্ব বোঝা যায় না। সদাচারের কৃষি করা উচিত। কর্তব্য হল বীজ, মনজমিতে সাংসারিক ক্ষেত্রে তাকে বপন করতে হয়। চিত্তের বৃত্তি হল জল, চিত্তবৃত্তিরূপী জলের অভাবেই ক্ষেত হয় শুষ্ক। তাই জল সিঞ্চনের কাজ তথা সদাচারের অনুশীলন অহরহ-নিরন্তর চালিয়ে যেতে হয়। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সদাচার অবিচ্ছেদ্য-অংশ। এই সদাচার পালনের বহুবিধ ক্ষেত্র থাকলেও সর্বজনবিদিত, সর্বজনসমাদৃত, সর্বজন অনুসৃত অতিথিপরায়ণাতার প্রাধান্য প্রদর্শন কল্পে এই তাত্ত্বিক আলোচনা।

গ্রন্থপঞ্জি

১. *অথর্ববেদ-সংহিতা* । গোস্বামী, বিজনবিহারী (সম্পা° ও অনু°)। কলকাতা : হরফ প্রকাশনী (৪র্থ প্রকাশ), বঙ্গাব্দ ১৪২১।

২. *অমরকোষ* । ভট্টাচার্য, গুরুনাথ (সম্পা°)। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, বঙ্গাব্দ ১৪০৮।

৩. *উপনিষদ্* (১ম ভাগ)। লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পা°)। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২১ (১০ম মুদ্রণ, প্রথম সংস্করণ) ১৯৯৯।

৪. *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী* (১ম,২য় ও ৩য় খণ্ড)। গম্ভীরানন্দ, স্বামী (সম্পা°)। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, (৩য় সংস্করণ) ২০২০।

৫. *ঋগ্বেদসংহিতা* (১ম ও ২য় খণ্ড)। দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনু°)। কলকাতা : হরফ প্রকাশনী, ১৯৬৩।

৬. *মহাভারত* । ভট্টাচার্য, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ (সম্পা°)। কলকাতা : বিশ্ববাণী প্রকাশনী (দ্বিতীয় সংস্করণ), বঙ্গাব্দ ১৩৮৩।

৭. *মহাভারত* (বঙ্গানুবাদ - বর্ধমান রাজবাটী)। কলকাতা : ভারবি, প্রথম ভারবি সংস্করণ, ১৯৭৬।

৮. *মহাভারত* । বসু, রাজশেখর (সারানুবাদ)। কলকাতা : এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড (১৫শ মুদ্রণ), বঙ্গাব্দ ১৪২২।

৯. *রামায়ণ আর্য্যশাস্ত্র* । শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রবর্তিত। তর্কাচার্য, কালীপদ ও শ্রীজীব ভট্টাচার্য ন্যায়তীর্থ (সম্পা°)। কলকাতা : শ্রীসীতারামদাস বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ১৯৭৮।

১০. *মনুসংহিতা* । বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পা°)। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার (৩য় সংস্করণ), বঙ্গাব্দ ১৪২৭।

১১. *যাজ্ঞবল্ক্য* । যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা°)। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার (পরিমার্জিত সংস্করণ), বঙ্গাব্দ ১৩৯৮।

১২. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* । দাস, করুণাসিন্ধু, বেচারাম ঘোষ ও সুবুদ্ধি চরণ গোস্বামী (সম্পা°)। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১০।

১৩. *বৈদিক সংকলন* (৩য় খণ্ড), অধিকারী, তারকনাথ ও সমীর কুমার মন্ডল (সম্পা°)। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো (১ম প্রকাশ), ২০২০।

১৪. *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* । জগদানন্দ, স্বামী(সম্পা°)। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয় (অষ্টম সংস্করণ), ১৯৬১ ।

১৫. অনির্বাণ। *বৈদিক সাহিত্য* (বেদ-মীমাংসা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো (১ম প্রকাশ), বঙ্গাব্দ ১৪১৮।

১৬. অভেদানন্দ, স্বামী। *ভারত ও তাহার সংস্কৃতি* । কলকাতা : শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ (৬ষ্ঠ সংস্করণ), ২০১০।

১৭. আচার্য, রামজীবন। *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপলোক* । কলকাতা : মেসার্স মন্ডল এন্ড সন্স ও শ্রীধর প্রকাশনী (১ম সংস্করণ), ১৯৬৫।

১৮. গুপ্তা, রাকেশ। *হিন্দু সংস্কৃতি* । নয়াদিল্লী : ডায়মন্ড পকেট বুকস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬।

১৯. ঘোষ, জগদীশচন্দ্র। *ভারত-আত্মার বাণী* । কলকাতা : প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৯৫৪।

২০. চক্রবর্তী, লোকনাথ। *চাওয়ার চতুর্মুখ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের কথা* । কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স (২য় প্রকাশ), ২০১৭।

২১. চট্টোপাধ্যায়, অশোক। *পুরাণ পরিচয়* । কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৭৭।

২২. চট্টোপাধ্যায়, ধূর্যটিপ্রসাদ। *রামায়ণ প্রকৃতি, পর্যাবরণ ও সমাজ* । কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড (১ম সংস্করণ), ২০১৬।

২৩. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *ভারত-সংস্কৃতি*। কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ।

২৪. জ্ঞানালোকানন্দ, স্বামী। *মূল্যবোধে ধন্যজীবন* । নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ : রামকৃষ্ণ আশ্রম (২য় সংস্করণ), ২০২০।

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়। *মানবজীবনের সার্থকতা* । কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয় (১ম প্রকাশ ২০১৭), ২০২২ ।

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার (সম্পা°)। *পৌরাণিকা* (২য় খণ্ড)। কলকাতা : ফার্মা কে.এল.এম., ১৯৮৮।

২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার(সম্পা°)। *ঊনবিংশতি সংহিতা* । কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, বঙ্গাব্দ ১৪০৭।

২৮. বসু, গিরীন্দ্রশেখর। *পুরাণ প্রবেশ* । কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (দ্বিতীয় সংস্করণ), বঙ্গাব্দ ১৩৫৮।

২৯. বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ। *ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা* । গুপ্ত, সুশীলকুমার(সম্পা°)। কলকাতা : ভারত লাইব্রেরী (১ম প্রকাশ), বঙ্গাব্দ ১৩৭২।

৩০. বোস, অনিতা। *রামায়ণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পদচিহ্ন* । কলকাতা :বি বুকস্ (১ম প্রকাশ), ২০১৯।

৩১. ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। *প্রাচীন ভারতীয় সমাজ* । কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০১।

৩২. ভট্টাচার্য, নারায়ণচন্দ্র। *অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি* । কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার (১ম সংস্করণ), বঙ্গাব্দ ১৩৭০।

৩৩. ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য* । কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ (১ম সংস্করণ), ২০১৫।

৩৪. ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য* । কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড (১ম সংস্করণ), বঙ্গাব্দ ১৩৯৪।

৩৫. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ। *আচার-বিচার-সংস্কার* । কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স (১ম সংস্করণ), ২০১৩।

৩৬. মুখোপাধ্যায়, গোপেন্দু। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* । কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি (২য় সংস্করণ), বঙ্গাব্দ ১৪২৬।

৩৭. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পা°)। *ভারত-সংস্কৃতির রূপরেখা* । নরেন্দ্রপুর, পশ্চিমবঙ্গ : রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ (১ম সংস্করণ), ২০০৩।

৩৮. সরকার, প্রদীপ। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও তৎকালীন সমাজ* । কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো (১ম প্রকাশ), ২০১৫।

৩৯. সাহা, বিশ্বরূপ। *ধর্মার্থশাস্ত্রপরিচয়* । কলকাতা : সদেশ, ২০০৯।

৪০. সেন, প্রবোধচন্দ্র। *রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি* । কলকাতা : জিজ্ঞাসা (১ম প্রকাশ), ১৯৬২।

৪১. Abayeb, J. *Daily Life in Ancient India*. London : Blackwell, 1

৪২. Bose, Ramchandra. *Hindu Philosophy*. New Delhi : Asian Educational Services, 1986.

৪৩. Chakraborti, Samiranchandra, *Brahmanasamgraha*, Kolkata : Sahitya Akademi, 2004.

৪৪. Hazra, Rajendra. *Puranic Records on Hindu Rites and Customs*. Dacca : Dacca University, 1940.

8৫. Parida, Saratchandra. *Hospitality in Changing Indian Society : Vedic Age to Puranic Age*, New Delhi : Bharatiya Vidya Prakashan, 2004.